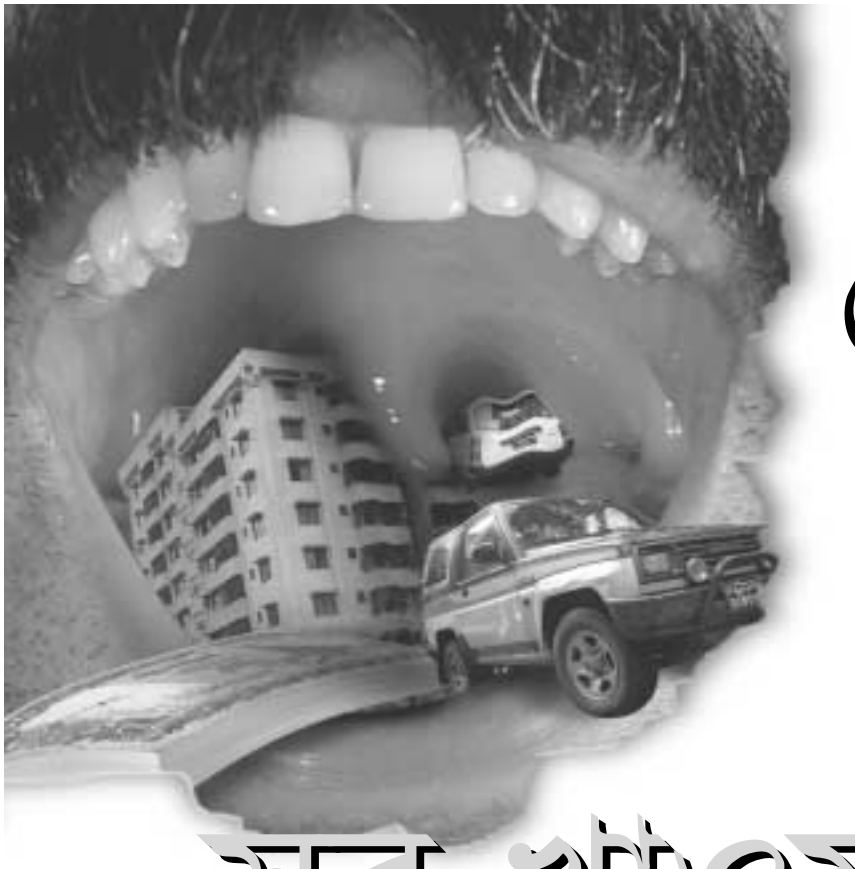

এমপি হলে...

বাড়ি, গাড়ি জমি, ব্যবসা প্রজেক্ট, টেন্ডার

সব খাওয়া যায়

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

১. '৯৬ সালে এমপি নির্বাচিত হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য। সংসদে না গিয়ে তিনি সরাসরি চলে গেলেন রাজউকে। রাজউক চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন কী করে তিনি ঢাকায় একটি প্লটের মালিক হতে পারেন। এরজন্য যে কোনো কিছু করতে তিনি রাজি। যাকে দিয়ে বলানো প্রয়োজন, তাকে দিয়েই তিনি বলাবেন বলে, পরোক্ষ হুমকি দিলেন চেয়ারম্যানকে। পরবর্তীতে তিনি শুধু একটি প্লটেরই মালিক হননি। এখন তিনি পাজেরো V-6 গাড়িতে চড়ে এলাকায় যান। অথচ এমপি হওয়ার আগে তার বাড়িতে ছিল একটি টিনের ঘর। গ্রামের সেই বাড়িতে এখন দোতলা বিল্ডিং উঠেছে। ঢাকার উত্তরায় তৈরি করেছেন পাঁচ তলার বিশাল বাড়ি। এগুলোর বাইরেও তার রয়েছে অনেক সম্পত্তি। সবকিছুই তিনি আয় করেছেন গত পাঁচ বছরে। এমপি পরিচয়ই তাকে করেছে মিলিয়নিয়ার।

২. ঢাকার একটি আসন থেকে তার মনোনয়ন নিশ্চিত হয়েছে। বাবার পরিচয়ই তাকে এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এমপি হওয়ার আগে, বাবার পরিচয়েই তিনি এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। গুলশান লেকের এক অংশ দখল করেছেন, ভরাট করেছেন। সেখানে গড়ে তুলেছেন বিশাল প্রাসাদ। জানা যায়, পুরো বাড়িটি নাকি বুলেট প্রুফ। নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। তবে ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে সাত কোটি টাকা। বাড়িটির নির্মাণ কাজ এখন স্থগিত। হয়ত এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর আরো সাত কোটি টাকা খরচ করে শেষ করবেন বাড়ির নির্মাণ কাজ।

পুরো বাড়িটি নাকি বুলেট প্রুফ। নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। তবে ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে সাত কোটি টাকা। বাড়িটির নির্মাণ কাজ এখন স্থগিত। হয়ত এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর আরো সাত কোটি টাকা খরচ করে শেষ করবেন বাড়ির নির্মাণ কাজ

এই ঘটনা দু'টিই বাংলাদেশের রাজনীতির স্বাভাবিক চিত্র। এমপি নির্বাচিত হতে হবে। সেটা না হলে যে কোনো ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে হবে। অথবা হতে হবে এমপি-মন্ত্রীদের পুত্র বা আত্মীয়। তাহলে কোটিপতি হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। উদাহরণ হিসেবে সামনে আছে দীপু চৌধুরী। মাসুদ, সাদেক আবদুল্লাহ, জুয়েলরা। এরা খুব সহজেই বাড়ি-গাড়ি, জমির মালিক হয়েছেন। নির্বিচারে দখল করেছেন সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি, করেছেন টেন্ডারবাজি। খুনির তালিকাতেও আছে কারো কারো নাম। দেশের আইন তাদের কিছুই করতে পারেনি। সম্প্রতি দীপু চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু জনগণের তথাকথিত বন্ধু পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো কেস নেই।

আশা করা হচ্ছে, তিনি অচিরেই জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন। এবং এবার না হলেও আগামীবার নিশ্চয়ই এমপি নির্বাচিত হবার চেষ্টা করবেন।

একটা সময় ছিল যখন রাজনীতিতে শিল্প-ব্যবসায়ী-আমলারা সাধারণত আসতেন না। তারা পরোক্ষভাবে রাজনীতিকদের সমর্থন করতেন। ব্রিটিশ ভারতে জিন্নাহ সাহেবকে সমর্থন জুগিয়েছেন ইস্পাহানীরা। গান্ধীকে বিড়লরা। পাকিস্তান পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের কারও কারও বিশেষ আগ্রহ ছিল। শেখ মুজিবের পেছনে পাকিস্তানি হারুণ গ্রুপের সমর্থন-সাহায্যের কথা সবার জানা। ছয় দফা আন্দোলন বেগবান হলে উঠতি বাঙালি পুঁজিপতিরা শেখ মুজিবের পিছে দাঁড়ান। মওলানা ভাসানীর পেছনেও ইস্পাহানীদের সমর্থন ছিল।

কিন্তু তারপরও রাজনীতি ছিল রাজনীতিকদের কাজ। রাজনৈতিক কর্মী মাঠে কাজ করে ধাপে ধাপে নেতৃত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। নির্বাচনের মনোনয়নে এই রাজনৈতিক কর্মীদের দেখা মিলত। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সংসদে মূলত এই রাজনৈতিক কর্মীরাই জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বস্তুত রাজনৈতিক কর্মীদের ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিল সংসদ ও অন্যান্য নির্বাচনে মনোনয়নের ভিত্তি।

সত্তরের শেষ ভাগে এসে রাজনীতি ক্রমশ ব্যবসা হয়ে ওঠে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এসে বিখ্যাত উক্তি করেন 'I will make politics difficult for the Politicians'। জিয়াউর রহমান তার মন্ত্রিপরিষদে রাজনীতির বাইরে প্রথমে বিভিন্ন পেশার লোককে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশকে কিনে নেন। এই সময় থেকে রাজনীতিতে আদর্শনিষ্ঠা, সংগ্রাম, জনসম্পর্ক কোনোটাই আর রইল না। সামরিক শাসনের অধীন জিয়াউর রহমানের প্রথম নির্বাচনেই টাকার কথা বলতে শুরু করল। আর এরশাদ আমলে এসে এই টাকাই নির্বাচনের প্রধান প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়াল।

বাংলাদেশের নির্বাচন এখন টাকার খেলা। ১৯৭৩ অথবা ১৯৭৯-এর নির্বাচনে যেখানে নির্বাচন করতে লাখ টাকার অধিক খরচ হত না, সেটা কোটির ঘরে পৌঁছেছে। নির্বাচনে এই টাকার খেলা সংসদ সদস্যপদকে টাকা বানাবার মেশিনে পরিণত করেছে। নির্বাচন ও রাজনীতি এখন কম পুঁজিতে সবচেয়ে সহজ ব্যবসা। ঝুঁকি কম অথচ লাভ প্রচুর। তার সাথে রয়েছে সামাজিক মানমর্যাদা, ক্ষমতার সাথে সম্পর্ক। সুতরাং ঐ এমপি পদ দেশের শিল্প-ব্যবসায়ী-অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের আকৃষ্ট করবে না, তবে কাদের করবে! গত নির্বাচন সম্পর্কিত একটি জরিপ বলছে যে, ১৯৯৬-এর ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মনোনয়ন প্রার্থীদের শতকরা ৪৮ ভাগ ছিল বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা হাউজের প্রতিনিধি। এমনও দেখা গেছে যে, একটি শিল্প-ব্যবসা হাউজের একজন একটি দলের মনোনয়ন প্রার্থী হয়েছেন, তার অপর সহযোগী হয়েছেন অন্য দলের প্রার্থী। এর সাথে যে বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত আছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর এবারের নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততা আরো বাড়তে যাচ্ছে। ঋণখেলাপি, করখেলাপি, বিলখেলাপিরা লাইন দিয়েছেন টিকেট কিনতে। কোনো কোনো জায়গায় তারা প্রতিষ্ঠিত পেশাদার রাজনীতিবিদদেরও হটিয়ে দিচ্ছেন। পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশে এ-বি-সি (আর্মি ব্যুরোক্র্যাট-ক্যাপিটালিস্ট) চক্র জাতীয় সমানভাবে ফ্যাক্টর নয়। বরং সবচে' বড় ফ্যাক্টর হিসেবে পুঁজিপতিরা আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।

এমপি পদ এখন এক পরিপূর্ণ ব্যবসা। ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ ঠিকভাবে করতে পারলে আসল তো উঠে আসবেই, লাভের অংকের হিসাব থাকবে না। বাংলাদেশের পার্লামেন্টের দিকে তাকালেই এ ধরনের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের খুব সহজেই চোখে পড়ে

বস্তুত, এমপি পদ এখন এক পরিপূর্ণ ব্যবসা। ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ ঠিকভাবে করতে পারলে আসল তো উঠে আসবেই, লাভের অংকের হিসাব থাকবে না। বাংলাদেশের পার্লামেন্টের দিকে তাকালেই এ ধরনের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের খুব সহজেই চোখে পড়ে। এদের মাঝে কেউ এমপি হয়ে ধনাঢ্য হয়েছেন, আবার কেউ ঐ পদকে ব্যবহার করে তাদের ধন-সম্পত্তির স্ফীতি ঘটিয়েছেন এমনভাবে যে, তারা দেশের সর্বোচ্চ ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

সংসদ সদস্যপদ কত সুখের হতে পারে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য সৈয়দ আবুল হোসেন তার প্রমাণ। এরশাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রে তার 'সাকো' ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পাওয়ার সেক্টরে একচেটিয়া ব্যবসা পেয়েছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগের ধনী প্রার্থী খোঁজায় কালকিনীর সংসদ আসনে তার মনোনয়ন জুটে যায়। এক সময় এই আসনটি ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করা জাতীয় পার্টির এককালীন নেতা শেখ শহীদের দখলে ছিল। শেখ পরিবার থেকে সম্পর্কচ্যুত শেখ শহীদের এই আসনটি নিতে শেখ হাসিনা সৈয়দ আবুল হোসেনকে মনোনয়ন দেন। উভয়ের কেউই ভুল করেননি। সৈয়দ আবুল হোসেন মাইনে করা লিখিয়ে রেখে শেখ হাসিনা ও শেখ পরিবারের ওপর কয়েক ডজন সুদৃশ্য পুস্তক প্রকাশ করেন। অন্যদিকে এমপি হিসেবে প্রতিমন্ত্রীর পদলাভে পুরস্কৃত হয়ে সৈয়দ আবুল হোসেন তার ব্যবসায়িক সংযোগ বাড়িয়ে চলেন। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি রুমে তাকে প্রায়ই দেখা যেত বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা বা বিদায় জানাতে। নিজের লাল পাসপোর্টও ঘন ঘন ব্যবহার করতেন বিদেশ যাওয়ার জন্য। কিন্তু প্রতিমন্ত্রীর পদের কারণে বিদেশ যেতে হলে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিতে হয়। সেখানে ফেঁসে গিয়ে প্রতিমন্ত্রীর পদ হারালেও সৈয়দ আবুল হোসেনের সর্বশেষ কীর্তি সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি সম্পাদন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র ক'দিন আগে এই চুক্তি সম্পাদন করে। নির্বাচনে এখন সৈয়দ আবুল হোসেনকে পরাজিত করতে পারে এমন কেউ নেই। নিজে নির্বাচনী এলাকায় কম যান। এলাকার মানুষই তার কাছে আসে। নিজের নামে অনেক কলেজ-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন বিভিন্ন স্থানে। আর এসবই সংসদ সদস্য হওয়ার ফসল।

ঢাকায় হাজী সেলিমকে কে না চেনেন। পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী হাজী সেলিম এখন সংসদের পরিচিত মুখ। সংসদে কৌতুকোদ্দীপক প্রশ্ন করে এবং রাজপথে হরতাল বিরোধী 'শান্তি মিছিলে'র সামনে হেঁটে হাজী সেলিম বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। তবে তার এই সৌভাগ্যের সূত্রও সংসদ সদস্যপদ। বিএনপি করতেন। আওয়ামী লীগ তাকে মনোনয়ন দিয়ে কিনে নেয় ছিয়ানব্বই সালে। তার এই সংসদ সদস্যপদের জোরেই হাজী সেলিম বুড়িগঙ্গার এপার-ওপারে অবৈধ স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গন্ডগোলের কারণে পাগলা-শ্যামপুরে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তা

অবরোধ করে রাখলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। দেশের সিমেন্টের বাজারে দাম-দরের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হাজী সেলিমের হাতে। হাজী সেলিমের হরতাল বিরোধী 'শান্তি মিছিল'-এ 'নাইন শুটার শটগান' নিয়ে

এমপি হলেই কোটিপতি

সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৩ সংখ্যা ২০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী। 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি'তে। বাংলাদেশে কোটিপতি হবার পাঁচটি শর্টকাট ফর্মুলা দেয়া হয়েছিলো। কোটিপতি হবার সহজ পদ্ধতি হিসেবে প্রথমেই এসেছিল 'রাজনীতি'। কারণ রাজনীতি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে লাভজনক পেশা। রাজনীতিতে কোনোমতে একবার ঢুকতে পারলেই হলো। আয় কোটির ওপরে কোটি। মন্ত্রী হবার দরকার নেই। এমপি হলেই চলবে। আর যদি দল ক্ষমতায় থাকে তাহলে তো কথাই নেই। টাকা ছুটবে আপনার পেছনে। এক্ষেত্রে পুঁজি টাকা নয়, রাজনীতি। এমন সাংসদ পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য যার ব্যবসা নেই। শুধু নিজের নামে নয়, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের নামেও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুলে বসে এমপি হওয়া ঐ রাজনীতিবিদ। রাজনীতি আর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা চলে আরো বেগবান গতিতে।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, কিছু মানুষ ঘুরেফিরে ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহে ঐ সব তথাকথিত রাজনীতিবিদরা দল ও জনগণের কথা বিবেচনা না করে দলবদল করেছে। স্বাধীনতার পরে দলবদলের রাজনীতি মূলত শুরু হয় '৭৫ পরবর্তী সময়ে। এই ধারা এখনও বিদ্যমান। প্রেসিডেন্ট জিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শীর্ষ ও দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতাদের নিজ দলে টেনে নিয়ে আসেন। '৯১ পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলো কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হলে এই প্রক্রিয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। '৯৬-এর শুরুতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় আবার।

সাতটি সংসদের প্রতিটি সাংসদের শুরুতেই ক্ষমতার লোভে রাজনীতিবিদরা নিজেদের বিক্রি করেছে। যে কারণে সাতটি সংসদে মোট ২,২৫৪টি আসনের মধ্যে ৫১৩ জন সদস্য ঘুরেফিরে বার বার নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৫ জন সদস্য ৫ বার করে, ৩৬ জন সদস্য ৪ বার করে, ১৪২ জন সদস্য ৩ বার করে এবং ৩৩০ জন সদস্য ২ বার করে নির্বাচিত হন। ৬ বার করে নির্বাচিত ৫ জনের মধ্যে ২ জন সদস্য ১ বার দলবদল করেছেন। অপর ২ জন সদস্য যথাক্রমে ২ ও ৩ বার করে দলবদল করে বার বার নির্বাচিত হয়েছেন। মাত্র ১ জন সদস্য দলবদল না করে মূল দল থেকে টানা ৫ বার নির্বাচিত হয়েছেন।

অনেক প্রবীণ, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ দলবদল করেছেন প্রকাশ্যেই বিচরণ করেছে সন্ত্রাসীরা। এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন বুড়িগঙ্গা তীরের অবৈধ স্থাপনা ভাঙা হচ্ছে তখন হাজী সেলিমের বিল্ডিং-এর কাছে এসে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল ঐ ভাঙার কাজ। স্বয়ং পুলিশ তার পক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার সংসদ সদস্যপদ না থাকার কারণে শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ভাঙা হয়েছে ঐ বিল্ডিং। আগামী নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়ে ফিরে এলে এসবের পুনরুদ্ধার হবে বলে আশা করে তার সমর্থকরা।

ডা. ইকবালের 'এ্যারোবেঙ্গলে'র কথা কমবেশি সবারই জানা। বেসরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ বিমান চালানোর ব্যবসাটি অবশ্য তার সফল হয়নি। তবে বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা রয়ে গেছে এই রাজনীতিবিদের। আমান-উল্লাহ আমানের উত্থান রাজনীতিতেই। নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা আমানউল্লাহ আমান 'ডাকসু'র ভিপি ছিলেন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর আমানকে সবাই সন্তুষ্ট করতে চাইত। এরশাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আমানকে তুষ্ট করার জন্য সবকিছু নিয়ে এগিয়ে যান। রাজনীতির সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্কটি ধরতে আমানের একটুও দেরি হয়নি। নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা অচিরেই মালিক হয়ে বসেন পাজেরো গাড়ির। শিল্প-ব্যবসায়ের মালিকানা খেলোয়াড়দের মত। লাভ যেখানে ছুটেছেন সেখানে। চেয়েছেন ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের কথা বলা যেতে পারে। তিনি প্রথম সংসদ সদস্য হন বিএনপি'র টিকেটে। দ্বিতীয় সংসদে এরশাদ তাকে দুর্নীতির দায়ে কারাগারে ঢোকালেও পরবর্তীতে তিনি যোগ দেন এরশাদের মন্ত্রিসভায়। মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েও তাকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। নিজ 'যোগ্যতা বলে' শেষ পর্যন্ত তিনি হয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১৯৮২ পরবর্তী রাজনীতিতে যে মওদুদ বিএনপিকে ছেড়ে এরশাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, সেই মওদুদই ১৯৯৬ পরবর্তী রাজনীতিতে বিএনপি'র একজন হয়ে গেলেন। এখন তিনি বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য। এমপি হবার আশায় সপ্তম সংসদের একটি উপনির্বাচনে বিএনপি'র টিকেটে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত দলগুলোতে আতাউর রহমান ছিলেন নিয়ামক ভূমিকায়। ষাটের দশকে প্রবীণ নেতা এবং জাতীয় লীগের প্রতিষ্ঠাতা আতাউর রহমান খান। প্রথম সংসদে তিনি ৩টি বিরোধী দলের ১টি জাতীয় লীগ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি সংসদে বিরোধী গ্রুপের নেতা ছিলেন। সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচনে কমপক্ষে ১০ জন সদস্যের প্রয়োজনীয় সংখ্যা প্রথম সংসদে ছিল না, থাকলে তিনিই বিরোধী দলীয় নেতা হতেন। দ্বিতীয় সংসদেও তিনি তার দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এরশাদকে প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের হত্যাকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে হটানোয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আতাউর রহমান খান নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে হয়ে যান এরশাদের প্রধানমন্ত্রী।

স্বৈরশাসকের আমলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের ক্ষমতায় থাকার একটি অলিখিত রেওয়াজ ছিল, সকালে সিকিউরিটিসহ গাড়ি না থাকলে বুঝতে হবে এবার বিদায়। অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকার দিন শেষ। এসব জেনেও বিভিন্ন দলের ত্যাগী নেতা-কর্মী নিজেকে বিক্রি করে ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছিলেন। তাদের সংখ্যাও অনেক। ১৫ ও ৭ দলের মানিকগঞ্জের জনপ্রিয় নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) হালিম চৌধুরীর বাসায় উভয় দলের সমন্বয় কমিটির বৈঠক চলছিল। ঐ বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে তিনি এরশাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

এই রকম উদাহরণ আছে প্রচুর। ক্ষমতার লোভে নিজেকে বিক্রি করা, নৈতিকতাকে বিক্রি করা রাজনীতিবিদদের সংখ্যা ও হিসাব ছাড়া। জাতীয় পার্টি (মি-ম)-এর সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী। রাজনীতিতে তার উত্থান-পতন বড়ই বর্ণাঢ্য। প্রথম সংসদে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হলেও দ্বিতীয় সংসদে মূল দল ভেঙে নিজেই গড়ে তোলেন আওয়ামী লীগ (মিজান)। তৃতীয় সংসদে তিনি

দেশের সিমেন্টের বাজারে দাম-দরের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হাজী সেলিমের হাতে। হাজী সেলিমের হরতাল বিরোধী 'শান্তি মিছিল'-এ 'নাইন শুটার শটগান' নিয়ে প্রকাশ্যেই বিচরণ করেছে সন্ত্রাসীরা

সহজলভ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। সংসদ সদস্যপদের বদৌলতে সেদিনের ছাত্রনেতার ভাগ্য বদলে যায়।

স্বাধীনতার পর টিসিবি'র কর্মচারী ছিলেন হাজী মকবুল। এখন তিনি মোহাম্মদপুর এলাকার বিরোধীর সব জমির মালিক। সম্পদের পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা কিনছেন নিজের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠিত কলেজ-স্কুলের দখল নিয়ে। সংসদ সদস্য হিসেবে পরিবহন মালিক সমিতির পদটিও তার দখলে। ডা. এইচবিএম ইকবাল সাংসদ হওয়ার সুবাদে বেসরকারি প্রিমিয়াম ব্যাংক স্থাপন করেছেন। আর তার আদম ব্যবসা তো সর্বজনবিদিত। আওয়ামী নেতা ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলিলও মার্কেন্টাইল ব্যাংক স্থাপন করে তার অর্থের পরিধি দেখিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য গতবার এমপি হতে না পাওয়ার অতৃপ্তি মেটাতে নওগাঁ থেকে জোরেশোরে নির্বাচনে নামবেন।

ঢাকার রহমতউল্লাহ, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান ও নাসিম ওসমান, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান বাবু, এ ধরনের আরও বড় বড় নাম করা যাবে যারা জনপ্রতিনিধিত্বের বদৌলতে নিজেদের অর্থ-বিত্ত-প্রাচুর্যে নাম করেছেন। আর এসব নামের সঙ্গে জড়িত ঐ সংসদ সদস্যপদ।

তবে এখন উল্টো হাওয়াও বইছে। কিছুদিন আগে এমপি পদ ছিল অর্থ-বিত্ত-

চলে আসেন ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টিতে। শুধু একজন এমপি নয়, ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে নিজের অবস্থান করে নেন। পঞ্চম সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিজের এলাকার জনগণের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে রংপুরে এরশাদের জিতে আসা ৫টি আসনে ১টি ছেড়ে দেয়া আসনে উপনির্বাচনে। দলে শীর্ষ ব্যক্তিদের ম্যানেজ করার দীর্ঘদিনের অসাধারণ ক্ষমতা এবং অন্য দলে যোগদানের ইচ্ছা থাকলেও পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'স্বৈরাচারের কোনো মন্ত্রী বা নেতাকে কোনো দলেই ঠাঁই দেয়া হবে না' বিরোধী দলগুলোর এই সিদ্ধান্তের কারণে কোনো দলে তার ঠাঁই হয়নি।

বিএনপি'র বর্তমানে সংসদীয় দলের হুইপ মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ-এর রাজনৈতিক জীবনের জার্সি পাল্টানোর ইতিহাস বড়ই চমৎকার। তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে ক্ষমতায় থাকাকালীন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হলেও পঞ্চম সংসদে অবস্থা বেগতিক বুঝে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হন। বক্তৃতাকে পুঁজি করে পঞ্চম সংসদের শেষ দিকে বিএনপিতে যোগদান করেন। ৬ষ্ঠ সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ এবং ৭ম সংসদে বিএনপি বিরোধী দলে থাকায় শুধুমাত্র হুইপ পদে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

অ্যাডভোকেট রেয়াজউদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া, সরদার আমজাদ হোসেন এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তিনজনই প্রথম সংসদে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংসদ। ভোলা মিয়া আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় সংসদে নির্বাচিত হন বিএনপি'র টিকেটে। '৮২ পরবর্তী বিএনপি'র দু' সময়ে এই ভোলা মিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হাত মিলান সেনাশাসক এরশাদের সঙ্গে। ক্ষমতা, মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি চতুর্থ সংসদে আসেন জাতীয় পার্টির লেবাসে।

'ছবছময়ই ছরকারি' দলে থাকেন মিরপুরের খালেক। তাকে নিয়ে প্রধান দুই দলের টানা-হেঁচড়ার কথা সবারই জানা আছে। দ্বিতীয় সংসদে সৈয়দ বংশীয় খালেক ক্ষমতাসীন বিএনপি, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি, ৫ম সংসদে ছেলেকে বিএনপি'র টিকেটে সংসদ সদস্য করে নেন। মিরপুরে এসএ খালেকের পোস্টারে সয়লাব। বিএনপি থেকে নমিনেশন পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এরকম উদাহরণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দেওয়া যায়। 'জনগণের সেবক' হিসেবে পরিচিত এসব রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থে এভাবে ডিগবাজি দেয়। সেখানে থাকে না নীতি, আদর্শ। আর বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোও এমন প্রার্থী খোঁজে যাদের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় যেতে পারে। ছোট রাজনৈতিক দলগুলো ছেড়েও নেতারা চলে আসে বড় দলের ব্যানারে। '৯৬ এর নির্বাচনে অংশ নেয়া জাতীয় পার্টি এখন তিনভাগে বিভক্ত। এখনও অনেক নেতা জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগে যোগ দিচ্ছেন। কারণ তারা বুঝে গেছে জাতীয় পার্টির এখন আর সাধ্য নেই তাদের ক্ষমতার স্বাদ দেয়ার। সেজন্যই সুযোগ বুঝে তারা ছুটছে বড় দলগুলোতে। রাজনৈতেক দলগুলোর চাই কোটিপতি প্রার্থী। ত্যাগী রাজনীতিবিদদের এখানে স্থান নেই। '৯১-এ শেখ হাসিনার বিপরীতে খুঁজে বের করা হয়েছিল গার্মেন্টস ব্যবসায়ী মেজর মান্নানকে। আওয়ামী লীগও '৯৬-এর নির্বাচনে প্রার্থী করেছিল ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ী ডা. ইকবাল ও শিপিং ব্যবসায়ী সাবের হোসেন চৌধুরীকে। তাই নির্বাচনে এখন হয় কোটিপতির লড়াই। ঢাকায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি'র যে ক'জন প্রার্থীই মনোনয়ন পাবে তারা সবাই নিঃসন্দেহে হবে কোটিপতি। শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, শিল্পপতিও বটে। সালমান এফ রহমান '৯৬-এর নির্বাচনে ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুরের আসনে 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন'-এর ব্যানারে নিজ দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এবার তিনি লড়বেন বিএনপি'র নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের টিকেটে। শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে তাকে ঢাকার দোহার থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

আরেক ধনকুবের এফবিসিসিআই'র সভাপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন কুমিল্লার মুরাদ নগর থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন। ঢাকা-১০ আসনে এবারও লড়বেন দুই কোটিপতি। আওয়ামী লীগের ডা. এইচবিএম ইকবাল এবং বিএনপি'র মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান। এছাড়াও আরো যেসব শিল্পপতি মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করছেন তারা হলেন, বায়রার সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন, বিজিএমআই নেতা শহিদুল হক শিকদার (লিটু), ইয়ুথ গ্রুপের অবুল কাশেম হায়দার, বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি খন্দকার মোশাররফ হোসেন, হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতির বর্তমান ও সাবেক সভাপতি যথাক্রমে সালাউদ্দিন আহমেদ ও কাজী শাহনেওয়াজ, বায়রার বর্তমান সহসভাপতি এইচএএম সেলিম, রূপসা গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী আসগর, ভাইয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান মোকছেদ আলী, নির্বাহী পরিচালক আবু সুফিয়ান প্রমুখ। এসব ব্যবসায়ী দেশ সেবার চেয়ে নিজ সেবাতেই যে বেশি ব্যস্ত থাকবেন তা নিয়ে খুব বেশি সন্দেহ নেই। 'জনদরদী, জনগণের সেবক' এসব বুলি শুরু পোস্টার কিংবা নির্বাচনী প্রচারণায় সীমাবদ্ধ। কারণ এদের নেই কোনো নীতি, দায়বদ্ধতা। নিজের সুবিধা এবং মর্যাদা লাভেন জন্য হতে চান সংসদ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মেজর জেনারেল (অবঃ) সুবেদ আলী ভুঁইয়ার কথায়। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আওয়ামী লীগ বিএনপি যে দল তাকে নমিনেশন দেয় সেই দলের ব্যানারে দাঁড়াবেন। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদের দলের আদর্শ কোথায়। অন্যান্যদের অবস্থাও প্রায় একই। দল, আদর্শ, নীতি এসব বড় কথা নয়, ব্যক্তিস্বার্থই বড় কথা।

বৈভবের সূত্র। এবার ঐ অর্থ-বিত্তশালীরা তাদের ঐ বিত্তের ওপর সামাজিক মর্যাদার ছাপ বসাতে নিজেরা সরাসরি নির্বাচনের মাঠে নেমেছেন ঐ বিত্ত নিয়ে। নূর আলী আর সালমান এফ রহমানের মত লোকজন যখন নির্বাচন করতে চান তখন এক অর্থে গণতন্ত্র নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। অর্থ আর বিত্তের প্রভাবে তাদের ক্ষমতা এমনিতেই অনেক বেশি। নতুন করে সাংসদ হলে তার কী লাভ। লাভ হচ্ছে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থকে রক্ষা করা, আর আরো অর্থের ব্যবস্থা করা। কেননা একজন ব্যবসায়ী টাকা বানানোর প্রত্যেকটি উপায়ই খুব ভালোভাবে বোঝেন। তিনি জানেন সংসদ ভবনের চৌহদ্দিতে ঢুকতে পারলে পাঁচ বছরের অর্জন বিগত বিশ বছরকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাই নির্বাচনের সময়ে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়।

ইউনিক গ্রুপের নূর আলীর গত কয়েক মাসের সাপ্তাহিক কাজ ছিল হেলিকপ্টারে নিজ নির্বাচনী এলাকায় যাওয়া।

সেখানে নেমেই তিনি স্কুল-মাদ্রাসা-রাস্তার জন্য লাখ লাখ টাকার অনুদান ঘোষণা করেছেন। এক হিসাবে এ যাবৎ তিনি দু'তিন কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন। তবে তারপরও নির্বাচনে ঐ বিনিয়োগের কোনো রিটার্ন আসবে বলে ভরসা নেই। দেশে আদম ব্যবসার পুরোধা নূর আলীর সংসদ সদস্যপদ না জুটুক, নির্বাচনে এই অংশগ্রহণই তার ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত করা।

নূর আলীর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার প্রশ্ন না থাকলেও, তার পাশের নির্বাচনী এলাকায় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপের সালমান রহমান। আওয়ামী লীগ শাসনে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে শেয়ার বাজার থেকে ৬০০ কোটি টাকা লুটে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঋণখেলাপি হিসেবে পরিচিতি লাভের পর এখন বইখেলাপি হয়েছেন। তার জন্যই ঋণখেলাপি আইনের সংজ্ঞা বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে। বইখেলাপির জন্য কোনো শাস্তি হয়নি। আওয়ামী লীগ থেকে তার মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়েছে নওয়াবগঞ্জ-দোহার থেকে। ইতিমধ্যে প্রতি ইউনিয়নে তিনি বেতনভুক কর্মী বাহিনী মোতায়েন করেছেন নির্বাচনী প্রচারণার জন্য।

চট্টগ্রামের জাতীয় সংসদের আসনসমূহের মনোনয়ন ও জয়-পরাজয়ের বিষয় নির্ধারণ করে সেখানকার সওদাগর-ব্যবসায়ীরা। এই ব্যক্তিরা রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দলে থাকলেও এবং বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে থাকলেও তারা একসঙ্গে বসেই নির্বাচনী আসন বন্টন করে বলে ভেতরের সূত্র জানাচ্ছে। এবারও তারাই নির্ধারণ করবে কে কোন দলে মনোনয়ন পাবে এবং কে কোন দলে জিতবে। আমীর খসরু মাহমুদ, মোর্শেদ খান, জাফর চৌধুরী, ওসমান জামাল, সোনা রফিক এ ধরনের মনোনয়নের মাঝে শ্রমমন্ত্রী আবদুল মান্নান অথবা সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান কোনোক্রমে টিকে আছেন। চট্টগ্রামের এসব মনোনয়নের একমাত্র লক্ষ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের একাধিপত্য বজায় রাখা।

এফবিসিসিআই সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন কুমিল্লা থেকে এমপি নির্বাচন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। চলছে টাকা ঢালার খেলা। আওয়ামী লীগের কাছের লোক হওয়ার সুবাদে ব্যবসায়ী থেকে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন কাজী জাফরউল্লাহ। শরিয়তপুরের ভাঙা থেকে এমপি নির্বাচনের টিকেট কিনতে চান তিনিও।

সংসদ সদস্যপদের এই মহিমা ছাড়া এখন যুক্ত হয়েছে সংসদের বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ। আগে মন্ত্রীদের এসব সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সংসদের কাছে মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এসব সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের পদ এখন সংসদ সদস্যদের জন্য নির্ধারিত। এই সংসদীয় কমিটি যে সংসদ সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সুযোগ এনে দিয়েছে, সংসদের কয়েকটি কমিটির কার্যক্রম তার প্রমাণ। সংসদের অনুমিত হিসাব কমিটি বা এস্টিমেট কমিটির বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজের ওপর খবরদারির সুযোগ না থাকলেও তার চেয়ারম্যানের কাছে সব মন্ত্রণালয় যেন জিম্মি হয়ে পড়েছিল। সপ্তম সংসদের এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

আর সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদের সুবিধার কথা ভেবেই বিরোধী দল বিএনপি অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন করলেও ঐ সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করেনি। সংসদ সদস্যদের টেলিফোনের জন্য মাসে একটা নির্দিষ্ট অংক দেয়া হলেও ঐ টেলিফোন বিল বাবদ সংসদ সদস্যদের কাছে বকেয়া রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। তবে সাধারণ টেলিফোন গ্রাহকের এজন্য টেলিফোন সংযোগ কাটা হলেও কেবলমাত্র সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য তাদের টেলিফোন সংযোগ কাটা যায়নি। এই টেলিফোন বিলখেলাপিদের সর্বশীর্ষে রয়েছেন আমানউল্লাহ আমান। প্রথম দশজন এই টেলিফোন বিলখেলাপির বকেয়া বিলের পরিমাণ দুই লাখ থেকে দশ লাখ পর্যন্ত।

কেবল টেলিফোন নয় সংসদ সদস্য হলে বেতন-ভাতার বৃদ্ধি ঘটে। ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বিদেশ যাত্রার অবাধ সুযোগ। সংসদ সদস্যদের লাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে আদম ব্যবসার ঘটনা বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম সংসদে একজন জামায়াত সদস্য তার লাল পাসপোর্টে একজন হিন্দু রমণীকে বিদেশ নিয়ে গিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

এই মধুর ভান্ডার সংসদ সদস্য তাই কে হতে না চাইবে। আর টাকা বিনিয়োগ করে ঐ টাকা তুলে নিয়ে আসা যখন এত সহজ কাজ তখন সংসদ নির্বাচন টাকার খেলা হবে না কেন? সংসদ নির্বাচনে এখন তাই হোন্ডা-মাইক্রোবাসের পর মোবাইল ফোন, হেলিকপ্টার, সি-প্লেন ব্যবহৃত হচ্ছে। টেলিভিশনের প্রাইম আওয়ার কিনে নেয়া হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের জন্য। স্থানীয় ক্যাবল অপারেটররাও এই সুযোগে ব্যবসা করে নিচ্ছেন।

একটা সময় ছিল যখন জনপ্রতিনিধিরা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মীরা নীচ পর্যায়ে থেকে কাজ করে ঐ সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হতেন। এখন সংসদ সদস্যপদ ছাড়াও সমস্ত নির্বাচনী ব্যবস্থাই ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। রাজনীতির বাণিজ্যিকীকরণ এর প্রধান কারণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর আরও বিশেষ কারণ, সামরিক শাসনকে রাজনৈতিক বৈধতা দিতে তথাকথিত নির্বাচনের প্রহসনের। ঐসব নির্বাচন কখনও অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। অস্ত্র এবং অর্থ নির্বাচনের নিয়ামক হয়েছে। অস্ত্রধারীদের নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। নির্বাচনে অর্থের আগমনে রাজনীতি, আদর্শ, কর্মসূচি সবকিছুই পিছিয়ে পড়েছে। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর সামরিক শাসকদের লাগানো সেই বিষবৃক্ষই মহীরূহে পরিণত হয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের পর অষ্টম সংসদেও যে এই টাকার প্রতিযোগিতা চলবে সেটাই ধরে নেয়া যায়। আর এক পয়সা দান করে সত্তর পয়সা সওয়াবের মতই এমপি সাহেবরা জনগণের কাছ থেকে সেই অর্থ উসুল করে নেবেন এটাই স্বাভাবিক।

বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা রয়ে গেছে এই রাজনীতিবিদের। আমান-উল্লাহ আমানের উত্থান রাজনীতিতেই। নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা আমানউল্লাহ আমান 'ডাকসু'র ভিপি ছিলেন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর আমানকে সবাই সন্তুষ্ট করতে চাইত